'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংগীত চিন্তা

-প্রসূন ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন, যখন বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে আধুনিক যুগ সবে আরম্ভ হতে শুরু করেছে।পুরাতন কালের শেষ রক্তচ্ছটা অবশ্য পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি তখন,আকারে ইঙ্গিতে তার বিলীয়মান আভা তখনো স্বর্ণাভ অতীতের সাক্ষ্য বহন করে যাচ্ছিল।আশ্চর্য এই সন্ধিলগ্নে,আধুনিকতার সোপানে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে ফেলে আসা সেই পুরাতন কালের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন।নির্মোহ দৃষ্টিতে সেই সময়ের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করে নবীন ও সনাতন,-বিভিন্নভাবে এই দুই রীতির মূল প্রভেদকে স্পষ্ট করেছেন,'*ছেলেবেলা*' কিংবা '*জীবনস্মৃতি*'-তে ব্যাপ্তভাবে যার রূপ ফুটে উঠতে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন,তখনকার কালে বর্ধিষ্ণু পরিবারে সংগীতের চর্চা বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হ'ত।দূরদেশ থেকে আমন্ত্রণ করে বাড়িতে সংগীতের আসর জমানো সেকালে সম্পন্ন অবস্থার লোকেদের আত্মসম্মানের অঙ্গ ছিল।বস্তুত ধনীরাই তখন দেশে সংগীতের গৌরব বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করতেন।তখন সেটি বিবেচিত হতো সামাজিক কর্তব্য বলে।

নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ বা নবশিক্ষা সংঘের বঙ্গীয় শাখা কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্মিলনীতে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন *'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান'* প্রবন্ধটি। বাংলাদেশে সংগীতকে চিরকাল লালন করে এসেছে ব্যক্তি ও সমাজ। সমাজের উচ্চ শ্রেণির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের পরিবারে সংগীত চর্চাকে মার্জিত রুচির পরিচয় বলে মনে করতেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সংগীতে পারদর্শী হতে উৎসাহিত করতেন আর সেকালে সংগীতবিদ্যার উপর অধিকার, বৈদগ্ধ্য তথা উন্নত রুচির প্রমাণ বহন করত। সংগীতের বিশুদ্ধ সুর-তাল-লয় বজায় না রাখা অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করা হত। রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন তাঁর বাল্যকালে কীভাবে সেকালের গায়কেরা হারমোনিয়াম,বক্স কিংবা কনসার্ট দিয়ে নয়, তম্বুরার সাহায্যে ধ্রুপদী সংগীতের মধ্য দিয়ে উচ্চমানের আসর জমিয়ে তুলতেন। প্রকৃতঅর্থে কালের উষ্ণ প্রবহমানতায় সমাজ চিরন্তন কিছু কিছু চিন্তারাজি বা বিদ্যাকে সঞ্চয় করে রাখে, যা চিরকালের একটি ইতিবাচক দিক। এই ইতিবাচক গুণকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতেন সমাজের ধনী ব্যক্তিরা। সঙ্গীতবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে ও আর্থিক যোগানের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি ঘটতো না সেদিন। লক্ষ্মী-সরস্বতীর যুগল মিলনে *'কমলহীরের পাথর'* থেকে আলো ঠিকরে পড়ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,"*সরস্বতী তখন লক্ষ্মীর দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করতে এসে মাথা হেঁট করতেন না,লক্ষ্মী স্বয়ং যেতেন ভারতীর দ্বারে অর্ঘ্য নিয়ে নম্রশিরে।*"

সংগীতকে কেন্দ্র করে দুই ধরনের ধারা তখন প্রচলিত ছিল,-একটির প্রাণকেন্দ্র অভিজাত মহলের বৈঠকখানা ও অন্যটি প্রবাহিত হতো জনমানসের শিরায় শিরায়।বৈঠকখানায় বৃত্তিভোগী যেসব গায়করা থাকতেন, তাঁদের কাছে কেবল ঘরের লোকেরাই নয়,বাইরের লোকেদেরও শিক্ষার পথ প্রশস্ত ছিল। ঠাকুরবাড়ির বাঁধা গায়ক যদুভট্টের কাছে নানা ধরনের মানুষ আসতেন সংগীত শিক্ষার জন্য।কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল,কেউ বা রাগিনীর আলাপ।অভিজাত বর্গের দ্বারা পরিচালিত হয়েও বিদ্যার দ্বার তখন সবার জন্যই ছিল উন্মুক্ত।

অন্যদিকে জনসমাজে সংগীতের ধারাটিও সেদিন সচল ছিল। এই ধারাটির ছিল বহু শাখা। নদীমাতৃক বাংলার মতোই সংগীতঋদ্ধ সামাজিকরা যাত্রা,পাঁচালী,কথকতা,কবিগান,কীর্তনের বহু শাখায় সংগীতের প্রবাহ অব্যাহত রেখেছিলেন। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হয় যে,সমাজের বিশিষ্ট ও গণমান্য ব্যক্তিরা অর্থ ও

বিদ্যা বিতরণের মধ্য দিয়ে সামাজিকদের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগীতের ধারাটিকে প্রাণবন্ত ও লাবণ্যময় করে রেখেছিলেন। ধনী সন্তানরা শখের যাত্রা সৃষ্টি করতেন। এই যাত্রা কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যদের উপভোগের সামগ্রী ছিল না, তা ছিল অবারিত। সর্বসাধারণ ছিলেন তার সমান দাবিদার।

বাঙালি সমাজে সাহিত্য ও সংগীতের কোনো জল বিভাজন রেখা ছিল না।ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে সংগীত বাক্যাশ্রয়ী নয়, সেখানে সংগীত যে কথাকে আশ্রয় করে তা উপেক্ষণীয়। সংগীত সেখানে বিশুদ্ধ আকারে দেখা দিয়েছে, সে সেখানে নিজেকেই প্রকাশ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে সংগীত ও কবিতা যেন পরস্পরের সহচর। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি হৃদয়ের স্বতোৎসারিত প্রকাশ ঘটেছে সাহিত্যে। কথা বা বাণীর প্রতি বাঙালি অন্তরের যেন স্বাভাবিক আকর্ষণ। এই কারণে বাংলাদেশে সংগীত সুর ও বাণীর যুগল মিলনে গড়ে উঠেছে, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় কীর্তনে।কীর্তনে একদিকে রয়েছে অপরূপ সংগীত অন্যদিকে পদাবলীর সৌন্দর্যমণ্ডিত বাণী। বাংলাদেশের সংগীতে রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা নেই।জনসংগীতে নিয়মের চ্যুতি ঘটেছে, সে চলেছে বাণীর দাবি মেনে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানেন যে,তাঁর গান সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন সাধনের মধ্যেই গড়ে উঠেছে। কেবল সংগীতই নয়,বাংলাদেশের বাদ্যযন্ত্রের নিজস্বতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন। বাংলাদেশে রাখালের বাঁশি কিংবা বৈরাগীর একতারা অন্যতম বাদ্যযন্ত্র। সেই বাদ্যযন্ত্র বীণা, সেতার,এসরাজ,সারেঙ্গীর তুলনায় নিতান্ত নগণ্য।এমনকি আধুনিককালে গড়ের বাদ্যের ব্যঙ্গ হিসাবে কনসার্ট-এর আবির্ভাব ঘটেছে তা তাঁর কাছে সহনাতীত।

বাংলার সংগীতের নিজস্বতা গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে সাহিত্য,আবার সাহিত্যের স্বকীয়তা নির্মাণে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে সংগীত।দৃষ্টান্ত হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সংরূপ নাট্যের উল্লেখ করেছেন। ইউরোপীয় নাটকে কথাযুক্ত গান সেভাবে স্থান পায় না অথচ বাংলা নাটকের নিজস্বতা গড়ে তুলেছে এই গান।এই কারণেই শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর গুরুগম্ভীর নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথকে গান লিখতে অনুরোধ করেছেন।ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা নাটক রচিত হলেও রবীন্দ্রনাথ জানেন তারও বহু আগে থেকে বাংলাদেশে যাত্রা প্রচলিত ছিল।সেই যাত্রায় নানাভাবে অঙ্গীভূত হয়েছিল কথকতা।এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলেই *'বিসর্জন'* কিংবা *'রাজা ও রানী'*-র মতো শেক্সপীয়রীয় প্রভাবে নাটক লিখেও দেশজ পরম্পরা মেনে '*শারদোৎসব*','*ফাল্গুনী*','*ডাকঘর*',*রক্তকরবী*-র মতো নাটক লিখতে পেরেছেন। সেখানে আদর্শ হয়েছে আপন অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আকুলতা,গানের সুরে ঢালা আমাদের নিজস্ব নাটগীতি বা যাত্রা ও আনন্দের তাগিদ এই তিনটি গুণের মিলনই সৃষ্টি করেছিল সেইসব অপরূপ সম্ভার।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় পুঁথি গলাধঃকরণের দিকে নজর দেওয়া হয়।ডিগ্রি পাওয়ার তাগিদে হত্যা করা হয় স্বাভাবিক আনন্দকে। যে গান ছিল আমাদের আনন্দের সম্পদ, যে গান ছিল আত্মসম্মান রক্ষার অঙ্গ, যে গান ছিল সম্মাননীয় বিদ্যা,-- গান সম্পর্কে সেই উচ্চ ও ঋদ্ধ ধারণা ক্রমশই বিনষ্ট হতে চলেছে, কেননা বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সংগীতকে আপন করে নেওয়া তো হয়নি, এমনকি মেনেও নেওয়া হয়নি। সংগীতের সরোবরকে বুজিয়ে পাঠ্যপুস্তকের জমি নির্মাণ করা হয়েছে। এ বড়ো আক্ষেপের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইতিবাচক বিশ্বাসকে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছেন,-"*বাঙালির প্রকৃতি আজ আবার আপন গানের আসর খুঁজে বেড়াচ্ছে,সুরের উপাদান সংগ্রহ করতে সৃষ্টি করছে। দেশের বিদ্যায়তন এই শুভ মুহূর্তে তার আনুকূল্য করবে,-একান্ত মনে এই কামনা করি।*"

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মলগ্ন ও বাল্যজীবনের বেড়ে ওঠার অপরূপ পরিমণ্ডলের উল্লেখ করেছেন। পিরালি পরিবারভুক্ত হওয়ার জন্য সেদিনের ঠাকুরবাড়ি ছিল প্রথাগত বাঙালি সমাজের চোখে অপাঙক্তেয়, যা তাঁর

পক্ষে শুভদায়ক হয়েছিল। কেননা এর ফলে লোকাচার যেমন গ্রাস করেনি পরিবারকে, তেমনি ঔপনিবেশিক শিক্ষা কলুষিত করেনি সেদিনের শিশুহৃদয়কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজ পাওয়া তাঁর অগ্রজদের সাধনা ছিল না,শিক্ষা তাঁদের কাছে ডিগ্রি অর্জনের মাপকাঠি বিবেচিত হয়নি । প্রথাগত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবনের সার্থকতা তাঁরা অনুসন্ধান করেননি। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ,হেমেন্দ্রনাথ,জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের তত্ত্বালোচনা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে সেদিনের দিনগুলি মুখরিত ছিল। সংগীতবিদ্যায় তাঁদের ছিল স্বাভাবিক অনুরাগ। তাই সে বিদ্যার সাধনা অন্যসব বিদ্যার চর্চাকে পরাভূত করতে পেরেছিল অনায়াসে। অগ্রজেরা তানসেনের মতো সংগীতবিদকে বাঙালির হৃদয়ের উপযোগী করে তুলেছিলেন। পরিবারে গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে ধ্রুপদী সংগীতের খ্যাতনামা গায়ক বিষ্ণুর গান সকলকে মুগ্ধ করত। বহু গুণীজন তাঁর কাছে গানের চর্চা করতেন। আবার দেবেন্দ্রনাথের পরিকর কিশোরী চাটুর্জে পূর্বে ছিলেন পাঁচালী দলের নেতা। সে গানের রাগিনী সনাতন হিন্দুস্থানী, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে বাজত বাংলা কাব্যের নিখাদ সুর।প্রগলভহীন এই সরল কাব্যময়তার জন্যই সাধারণ সমাজে এসব গান বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল।কারণ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের উচ্চাঙ্গের কালোয়াতি বোঝার মতো সংগীত শিক্ষা ছিল না। তাঁরা কেবল সেটাই বুঝত যাতে তাদের দৈনন্দিন যাপন প্রতিফলিত হয়।বাঙালির ভাবপ্রবণ হৃদয় তাই সেদিন আত্মপ্রকাশের জন্য হিন্দুস্থানী বা অন্য দেশের সঙ্গীতশাস্ত্র,কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে কুন্ঠাবোধ করেনি।এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গতিপূর্ণ অভিমত,"*বাঙালি গানকে ভালোবেসেছে বলেই সে গানকে আদর করে আপন হাতে আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করতে চেয়েছে।*"এই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই শিখেছিলেন গান-বাজনা-নাট্যকলার মত বিদ্যাকে সম্মান করতে,শিখেছিলেন সে বিদ্যাকে নিজের করে নিতে।

শুধু তাই নয়,পরবর্তী প্রজন্মও এই ধারাটিকে বজায় রেখেছিলেন,যার ফলে রবীন্দ্রনাথ সংগীতবিদ্যায় নিজে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছেন, তেমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি করেছেন ঋদ্ধ সংগীত। সেকালের একজন বিখ্যাত গায়িকা ছিলেন হেমেন্দ্রকন্যা প্রতিভা।সত্যেন্দ্র কন্যা ইন্দিরা ইংল্যান্ডে ছেলেবেলা অতিবাহিত করার দরুন ইউরোপীয় সুর-তাল-লয় সম্পর্কে সমঝদার ছিলেন। অন্যদিকে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সূত্রে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে পরিভ্রমণ করতেন আর সংগীতের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশত প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকসংগীত আকৃষ্ট করত তাঁকে।'*রবি মামা*'-কে সেই সব গান শোনাতেন তিনি আর *'রবিমামা'* সুর শুনে আপন কথা বসিয়ে গড়ে তুলতেন নতুন নতুন আশ্চর্য সব সংগীত। প্রথা ভাঙার যে রীতি ঠাকুরবাড়িতে শুরু হয়েছিল,সেদিন তা নিয়ে কদর্য পরচর্চা হয়নি।মেয়েদের সংগীত সাধনাকে বিদ্রূপ করা হয়নি।এর কারণস্বরূপ সংবাদপত্রের দাঁত-নখ সেদিন সেভাবে উগ্র হয়ে দেখা দেয়নি বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের সদর্থক উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে।রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, যা প্রয়োজনকে অতিক্রম করে আপনাকে প্রকাশ করে,সেই অমৃতের সাধনাতেই মনুষ্যত্বের চরম মহিমা নিহিত। সেই অনির্বচনীয়তাকে উপলব্ধি করা যায় কথায়- সুরে-রঙে-ছন্দে।মানব সম্পর্কের মাধুর্যে মানুষই পারে আনন্দকে অমর করে রাখতে। শিক্ষাজগতে সংগীত স্থান পেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সংগীত সাধনার মধ্য দিয়ে দেশ গৌরবান্বিত হবে,অন্তিমে এই প্রত্যাশা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।